

মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

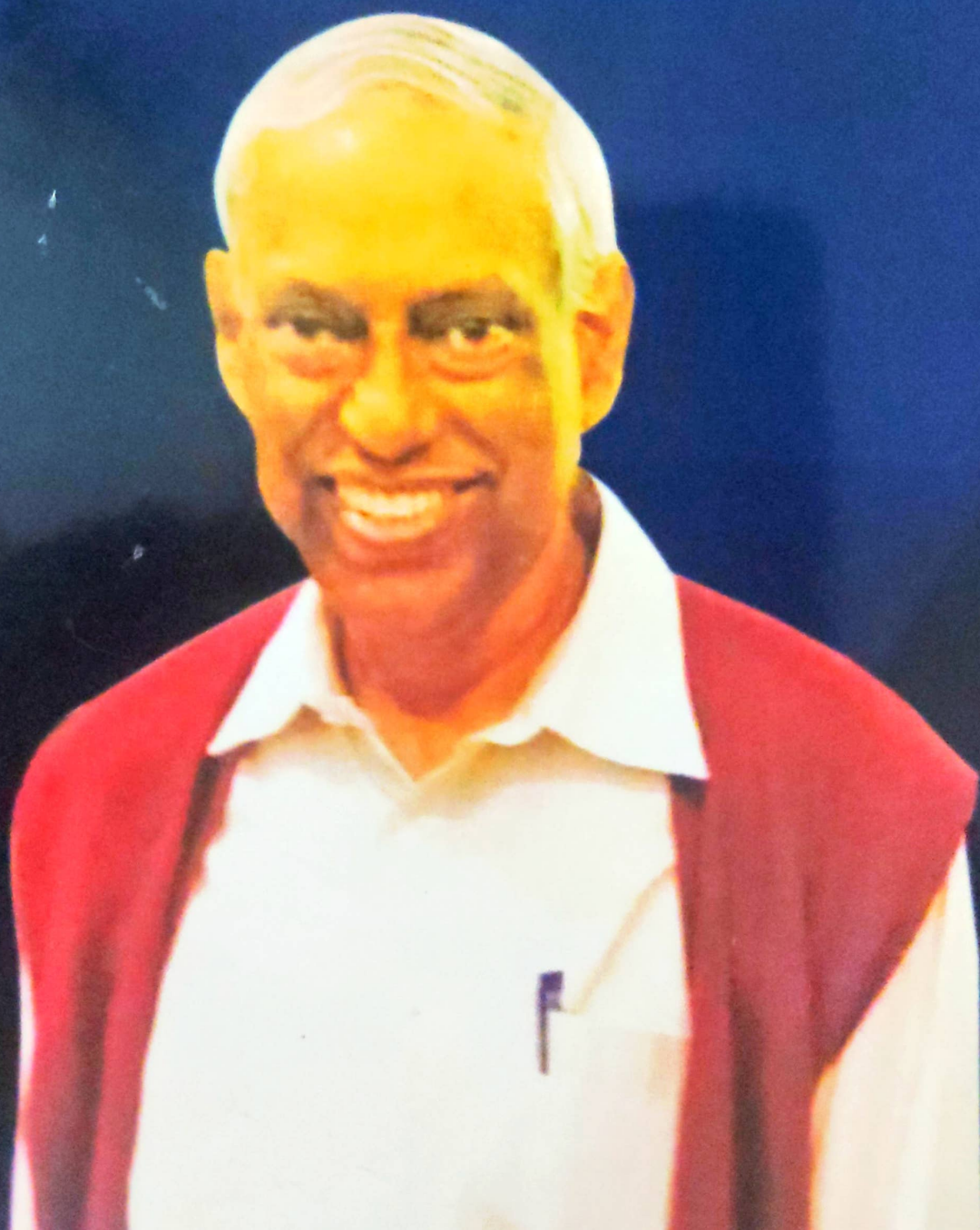
বিপ্লব হালিম-এর

৭২তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

ও

বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান প্রদান

(২য় বর্ষ)





স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গণতন্ত্র। বহুত্বের ভারতে ‘এক দেশ এক সংস্কৃতি’ যে উন্নয়নের কাণ্ডারী হতে পারে না সেই উপলব্ধি থেকেই রচিত দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান, যেখানে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি পরে যুক্ত হলেও, সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যেই প্রোথিত আছে, সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির মূল দিকনির্দেশ। স্বাধীনতার ৭৩তম বছরে তাই বহু তুফান অতিক্রম করেও, ভারত

বিশ্বের দরবারে এক উন্নয়নশীল, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র হিসেবে সম্মানের আসনে আসীন।

‘নানা ভাষা, নান মত, নানা পরিধানের’ ভারতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে একসময়ে সরকারের যেমন সদর্থক ভূমিকা ছিল, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে দৈনন্দিন জীবনে, পরমত সহিষ্ণুতার জন্য, ধর্মের নামে রাজনীতি থেকে মানুষকে বিরত করতে ও শান্তি এবং সম্প্রীতির নজির গড়তে নিরলস ভাবে কাজ করেছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মীরা; তাঁরা সাধারণ মানুষকে উদবুদ্ধ করেছেন মানবতার মন্ত্রে ও ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চারা এঁরাই আজীবন সিঁধিত করেছেন, কথায় ও কাজে। প্রয়াত মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী বিপ্লব হালিম ছিলেন এঁদেরই একজন।

শৈশবেই ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠ তাঁর নিজের বাড়িতে, পিতা আবদুল হালিমের হাত ধরে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবদুল হালিম, যিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পথিকৃত ছিলেন, ব্যক্তি জীবনে আদ্যোপান্ত নাস্তিক হলেও চিরকাল পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। শোনা যায় সদ্য স্বাধীন ভারতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতার অলিগলিতে তিনি নির্ভয়ে ঘুরতেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে। তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবল থেকে বহু অনামী মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন বলেও কথিত আছে।

সেই উত্তাল সময়েই কলকাতায় জন্ম বিপ্লব হালিমের। জন্মসূত্রেই যেন অর্জন করেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্র। পরবর্তীতে তার পরিবারই যেন এক ক্ষুদ্র ভারত, বৈচিত্রে ও ঐক্যে।

মা অশ্রুকা হালিম, জন্মসূত্রে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হলেও দীক্ষা নিয়েছিলেন কমিউনিজমের মন্ত্রে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। নিজের দিদিমা, যিনি ছিলেন খ্রিষ্টধর্মপ্রচারিকা, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে ওঠেন বিপ্লব হালিম। তবে আশৈশব ধর্মের বেড়াজালের উদ্বেগেই।

কৈশোর থেকেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা তাঁর যুক্তিবাদী মননকে আরো ক্ষুরধার করে। যৌবনে গতানুগতিক গদি সর্বস্ব রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, মেহনতী মানুষের লড়াইয়ে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন তিনি। মানুষের সাথে পথ চলতে চলতে তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পাঠ। আরো নিবিড়ভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করার জন্য দলীয় রাজনীতি ছেড়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইমসে নামের এক সামাজিক সংগঠনের, আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে। প্রত্যন্ত গ্রামের গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষকে অধিকার নিয়ে সচেতন করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নয়, ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার সংগঠনের কাজ প্রসারিত করেছিলেন। বিপুল সে কর্মযজ্ঞে একদিকে যেমন ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার উন্নতি সাধনের কাজ, তেমনি মানুষকে সমাজ সচেতন করা, পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির বাঁধন দৃঢ় করা ও শান্তির প্রসার ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই উদ্দেশ্যে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন লোকসংস্কৃতি দল। গ্রামে গ্রামান্তরে মানুষের কাছে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা তারা পৌঁছে দিতেন সহজ ভাষায়, লোকজ রীতি ও গানের মাধ্যমে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিপ্লব হালিম, বীরভূম হিতৈষী নামের এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। তার সম্পাদকের কলমে বার বার ধরা পড়েছে শান্তি ও সম্প্রীতির কথা। ধর্মকে জনতার আফিম বলেই বিশ্বাস করতেন তিনি, কিন্তু নিজের মত জোর করে অন্যের উপর চাপানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন বিপ্লব হালিম। বিশ্বাস করতেন গঠনমূলক আলোচনায় ও সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর।

দেশে যখন সাম্প্রদায়িক হাওয়া গরম হতে শুরু করে, তখন তিনি বিশিষ্ট সমাজবিদদের সাথে নিয়ে স্থাপনা করেন PANNICH বা People's Action

Network for National Integration and Communal Harmony. এই সংগঠন একাধিক বই প্রকাশ থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য বহুবিধ কাজ করেছে এবং এখনো ছোট আকারে হলেও সেই কর্মকাণ্ড অব্যাহত। শিখদের বিরুদ্ধে হওয়া দাঙ্গা থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পথে নেমে, মানুষের মাঝে গিয়ে সম্প্রীতির বাঁধনকে শক্ত করেছেন বিপ্লব হালিম। তাই বর্তমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সংকটকালে আরো বেশি করে মনে পড়ে এই কর্মযোগীকে, যিনি মানুষের সাথে মানুষের মনকে সাম্যের গানে বেঁধে গেছেন, অনাড়ম্বর ভাবে। ভঙ্গী সর্বস্বতাতে তার কোনদিনই বিশ্বাস ছিল না।

আজ দেশে সাম্প্রদায়িক বিষ যখন রাজনীতির মূল রসদ, যখন সাধারণ মানুষও সেই অফিমের নেশায় বঁদে হয়ে, প্রতিনিয়ত নিজেই নিজের মানবাধিকারকে পদদলিত করেছে, যখন যুদ্ধের উন্মাদনায় শান্তির বাণী ভুলুগ্ঠিত, যখন শান্তি ও সম্প্রীতিকামী মানুষদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে নানা উপায়ে, তখন বিপ্লব হালিমের মত এক দরদী জননেতার অভাব শূণ্যতাবোধের আরেক নাম। তবে চির আশাবাদী বিপ্লব হালিম, তার কঠিন কর্মময় জীবনে কোনদিন হাল ছাড়েননি। তাঁর পরিবার আর সহকর্মীরা, যারা তাঁর আদর্শে দীক্ষিত এখন তাদের পালা সেই বিপ্লবের পতাকা বহন করে চলার। নিরহংকার, সদালাপী বিপ্লব হালিমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেটাই সেরা প্রজ্ঞার্থ্য।

তাঁর ৭২তম জন্মদিবসে (১৯৪৭-২০১৭) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শীর্ষক আলোচনা সভার সাফল্য কামনা করি।

উজ্জয়িনী - স্মারক

উজ্জয়িনী হালিম

ইমসে

সাবিনা ইয়াসমিন



সমাজের পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত, অসহায় মানুষের কাজ করার প্রবল তাগিদ আর মহৎ উদ্দেশ্য, এই দুটোকে মূলধন করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের কোনও প্রতিকূলতা কিংবা বাস্তবের কঠিন চ্যালেঞ্জ, কোনকিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনা। সৎ প্রচেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁরা খুঁজে নেয় সঠিক দিশা এবং উত্তরণ।

সাবিনা ইয়াসমিন হলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘির এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রাম্য পরিমন্ডলে বড়ো হওয়ার সময় থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, গ্রামের মানুষেরা অনেকরকম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কাজকর্মের সুবিধা কিছুই তারা পান না। এমন কী পানীয় জলের অভাবে নানা অসুখ বিসুখের তারা শিকার। গ্রামের পিছিয়ে পড়া খেটে খাওয়া মানুষের অতিকষ্টের জীবনযাপনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই, অন্য কিছু একটা করার একান্ত আগ্রহ নিয়ে সেইসব মানুষদের বিপদে আপদে পাশে থাকার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্যও কঁদে ওঠে তাঁর মন। আদিবাসী মানুষদের বেঁচে থাকার দুর্দশা তাকে খুব কষ্ট দিত। কষ্ট পাওয়া থেকেই স্বপ্ন দেখতেন কীভাবে তাদের পাশে থেকে তাদের জন্য ভালো ভালো কাজ করা যায়। সরকারী বেসরকারী স্তরে যে সব সুযোগসুবিধা তাদের জন্য বরাদ্দ আছে, সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে ছোট্টাছুটি করে তাদের সেই সব সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কাজে সবসময় নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তোলেন।

ভৌগলিক কারণে যে সমস্ত মানুষেরা পাহাড়ের নিচে কিংবা জঙ্গল ঘেরা দূরবর্তী এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেন, সেইসব এলাকার বাচ্চাদের মূলশ্রোতে ফেরানো, মানসম্মত পড়াশুনো, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী, বৃক্ষরোপণ ও সৃজনশীল কর্মসূচী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের মধ্যে এক অন্যরকম উদ্দীপনার আবহ তৈরী করে চলেছেন। কর্মসূত্রে যেখানে যেখানে তিনি থেকেছেন সেখানেই শুরু করেছেন পিছিয়ে থাকা দুর্বল মানুষদের আলোর দিশা দেখানোর কাজ।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সুপারামর্শ ও আশীর্বাদ তাঁর একমাত্র পাথেয়। কঠিন চ্যালেঞ্জের সময়ে যারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস এবং অনুপ্রেরণা জোগান, তারা হলেন, মা সুফিয়া বিবি, আব্বা মহিউদ্দিন শেখ, শিক্ষক এবং অভিভাবক শ্রী পাথ

সেনগুপ্ত মহাশয়, শিস-এর ডাইরেক্টর এম. এ. ওয়াহাব সাহেব, শান্তি নোবেল জয়ী শ্রী কৈলাস সত্যার্থী স্যার, এন.আই.আর.ডি. হায়দ্রাবাদ-এর পূর্ববর্তী ডি.জি. এবং বর্তমান পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রী এম. ভি. রাও সাহেব এবং বিশিষ্ট সমাজদরদী ইকবাল তরফদার ও রাজীব লামা প্রমুখ। মানুষের সাহায্য করা বা মানুষের মঙ্গল সাধন করা নয়, মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করার অদম্য মানসিকতার এবং সাহসীকতার দৃষ্টান্ত রচিত হোক তাঁর এই কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে।

দুর্জয়কে জয় করার প্রত্যয়ে অটুট রেখে সাবিনা ইয়াসমিনের পথ চলাকে আমরা ‘বিপ্লব হালিম স্মারক’ সম্মান জানাই ও তাঁর আগামী পথ চলা যাতে সুগম হয় তাঁর জন্য জানাই শুভেচ্ছা।

২০১৯-র সম্মানিত সমাজসেবিকা

শ্রীমতী কল্যাণী পালুই



শ্রীমতী কল্যাণী পালুই-এর জন্ম হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের তুলসীবেড়িয়া গ্রামে। গ্রামেই বেড়ে ওঠা ও মাধ্যমিক পাশ। ছোটবেলায় গ্রামের মধ্যে বিদ্যালয় যাবার পথে দেখতেন রাস্তায় একাধিক চোলাই মদ তৈরীর ভাঁটি চলছে। এর ফলে এলাকায় মাতলামি, গালি-গালাজ গন্ডগোল, এক নিত্য ত্রাসের আবহাওয়া যেন চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিশোরী বয়সেই এই আবহাওয়া তাঁর ভালো না লাগলেও এর পরিবর্তন কিভাবে করা যায়, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ক্রমে কল্যাণী পালুই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন, দুই পুত্র সন্তানের জননী হলেন। এই সময়ে তাঁর স্বামী অকালে প্রয়াত হন। পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করতে তিনি যুক্ত হলেন সামাজিক সংস্থার কাজে। কর্মসূত্রে গ্রামের বাইরে হাওড়া কোলকাতা ইত্যাদি জায়গায় যাতায়াতের ফলে পরিচিত হলেন বাহির জগতের পরিবেশের সাথে। বুঝলেন তাঁর গ্রাম কতটা পিছিয়ে আছে।

ইতিমধ্যে তাঁর প্রতিবেশী এক পরিবারে, দাদার মৃত্যুতে শশ্মানে গিয়ে ভাইয়ের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান এবং সৎকার কার্য শেষে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে সেই ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা তাঁকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করে। পাশাপাশি মদের নেশায় ঘটে চলা বউ মেয়েদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন তাঁর মনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত ভাবে লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা নির্যাতিত পরিবারের স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো শুরু করেন তিনি। মাদকশক্তিই যে সংসারের অভাব অনটন

গাইখা অশান্তির অন্যতম বড় কারণ, এটি তিনি ভালোমত উপলব্ধি করেন।

তার এই চিন্তা চেতনা তিনি ছড়িয়ে দেন এলাকার গরীব, নিষাতিতা মহিলা, দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া পরিবারগুলির মধ্যে। ক্রমশ এই মানুষগুলি হয়ে ওঠে তাঁর সহকর্মী। এদের সাথে নিয়েই তিনি পেলেন পথ চলার শক্তি ও সাহস। সমাজের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে অগ্রণী মহিলাদের নিয়ে দল তৈরী করলেন, Resistance Group বা প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী হল। যোগাযোগ করলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত, পুলিশ প্রশাসন, স্কুল শিক্ষক এবং গ্রাম সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এই উদ্যোগের বাস্তবায়নে ২০০৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মাদকের কুফলের বিরুদ্ধে জন চেতনা গড়ে তুলতে সংগঠিত করা হল এক মহামিছিল। তৈরী হল তুলসীবেড়িয়া মহিলা প্রতিরোধ দল। ২০১১ সালে ৬০টি চোলাই মদের ভাঁটি উচ্ছেদ করা হল। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নানা বাধা, হুমকি ও মামলার মুখে পড়েও কাজ চালিয়ে গেছেন, অবিরাম। ভেঙ্গে দেওয়া ভাঁটিতে পুতে আবার মদ ব্যবসা গড়ে না ওঠে তার জন্য নিয়মিত ভাবে মহিলাদের সতর্ক পাহারা আর মিটিং মিছিলের আয়োজন করা হয়।

অতিমধ্যে লাগোয়া ১০টি গ্রামে তাঁরা কাজের আরো প্রসার ঘটান, অকাল বৈধব্যের শিকার মহিলা ও দুঃস্থদের মধ্যে। মদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে সাথে, পূর্ণগঠনের কাজে নামলেন তিনি। ‘খানপুর গণ উন্নয়ন কেন্দ্র’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠন করলেন ও এই সংস্থার মাধ্যমে অসহায় মহিলাদের মধ্যে ছাগল পালন, জরির কাজ, ঠোঙা তৈরী, সবজি ব্যবসা আর দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ ইত্যাদি কাজের সূচনা করলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস, পরিবেশ দিবস, রাখি বন্ধন উৎসব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা সভা পদযাত্রার মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে এক অমোঘ সামাজিক বন্ধন ও অধিকার সচেতনতার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন তিনি নিরলস। তাঁর সংস্থা নিষাতিতা মহিলাদের আইনী সহায়তা পেতে সাহায্য করে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য প্রচার করে থাকে। এছাড়া এলাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিষেবা ঠিকঠাক চলছে কিনা তাঁর খোঁজ রাখা, কোন দুর্নীতি হলে প্রতিবাদ করা, এসব তাদের রোজকার কাজ।

কল্যাণী পালুই তাঁর কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন যেমন গ্রামের মানুষদের ভালোবাসায় তেমনি ২০১৭তে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় শশী পাঁজার হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়াও Rotary Club of Calcutta, Nehru Yuva Kendra Howrah, উলুবেড়িয়া মহাকুমা সাহিত্য পরিষদ ও আরও অনেক সংগঠন থেকে পুরস্কার পেয়েছেন।

আজ তুলসীবেড়িয়া এলাকায় এখন আর একটিও চোলাই ভাঁটি চলে না, ছেলে মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যায়। তুলসীবেড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকায় মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করা গেছে। পাশাপাশি তিনটি ব্লকের মহিলারা আজ সংগঠিত। এ এক বড় জয়।

নৈতিকতার উত্তরণে নিশ্চয় একদিন নেশা ও হিংসামুক্ত সুস্থ সমাজের বিকাশ হবে, এই স্বপ্ন দুচোখে মেখে এগিয়ে চলেছেন কল্যাণী দৃঢ় পদক্ষেপে। তাঁর এই নিঃস্বার্থ জনসেবার প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা ও তাঁকে আমরা বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মানের মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

২০১৯-র সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী শঙ্কর বেহেরা



শঙ্কর বেহেরার জন্ম উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার সাহাবাজিপুর গ্রামে, দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারে। ছোট থেকে অভাব ও বঞ্চনার সাথে তার পরিচয়, ছোট থেকেই শুরু বেঁচে থাকার লড়াই। দারিদ্রতা সত্ত্বেও তার মায়ের উৎসাহে প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ করেন শঙ্কর। এরপরে কৈশোরেই জীবিকার তাগিদে উত্তাল সমুদ্রে ছোট ডিঙি নৌকায় অন্যান্য প্রত্যন্ত মৎস্যজীবীদের সাথে রুটিরুজির খোঁজে পথ চলা শুরু।

কিন্তু আর পাঁচজন দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মত অভাব ও বঞ্চনাকে কপালের লেখা বলে কোনদিনই মেনে নেন নি শঙ্কর। বৈষম্য ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সবসময়েই অন্যদের সংগঠিত করার ও প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন নিজের উদ্যোগে, সীমিত ক্ষমতায়।

১৯৮০ সালে উড়িষ্যার বালীয়াপালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি সামরিক ক্ষেপনাস্ত্র ঘাটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় যার ফলে প্রায় ১০০র বেশী উপকূলীয় মৎস্যজীবী ও কৃষকদের গ্রামগুলি উচ্ছেদ হবে বলে ঘোষণা করা হয়। লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকা যখন বিপর্যস্ত, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত, তখন বিপ্লব হালিম উড়িষ্যার ঐসব উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গড়ে তোলেন গণ প্রতিরোধ। এই উত্তাল সময়েই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ শঙ্কর এক জনসভায় বিপ্লব হালিমের বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হন ও এক সামাজিক কর্মী হিসাবে জন সংগঠনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। গণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি একাধিকবার কারাবরণও করেন।

এরপর কেটে গেছে বহু বছর, বিপ্লব হালিমের সান্নিধ্যে শ্রী শঙ্কর বেহেরা একজন প্রতিবাদী কিশোর থেকে ক্রমশ পরিণত হয়েছেন একজন অতি পরিচিত জননেতায়। উপরোক্ত অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনের ফলে সরকার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কিন্তু শঙ্কর বেহেরার কাজ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গরীব মানুষকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য, অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তাদের জোটবদ্ধ করার জন্য ও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে সাধারণ মানুষের

পাশে পাড়ানোর জন্য, তাঁর ৩০ বছরের নিরলস সমাজসেবার জন্য আজ উড়িষ্যার মৎস্যজীবী ও কৃষক সমাজে তিনি সুপরিচিত ও সমাদৃত। মৎস্যজীবীদের নিয়ে গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়ন EAST COAST FISH WORKERS' UNION-এর তিনি আজ সাধারণ সম্পাদক ও দেশে তথা বিদেশে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের একজন পরিচিত নেতা। এছাড়াও নিজের উদ্যোগে আইন নিয়ে চর্চা করে আজ গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলিকে তিনি আইনী সাহায্যও প্রদান করেন।

নিজের আর্থিক সঙ্কট ও নানান পারিবারিক সমস্যা সত্ত্বেও, ৩০ বছর ধরে শঙ্কর বেহেরা সমাজসেবার নানাদিকে নিজের অবদান রেখেছেন, চিরকালই প্রচারের আলোর থেকে দূরে। শ্রী শঙ্কর বেহেরার কাছে বিপ্লব হালিম ছিলেন পিতৃতুল্য, তাঁর আদর্শেই আজও পথ হেঁটে চলেছেন তিনি। শ্রী শঙ্কর বেহেরার সারা জীবনের সমাজসেবামূলক কাজকে আমরা 'বিপ্লব হালিম স্মারক' সম্মান জানাই ও তাঁর ভবিষ্যত সমাজসেবামূলক কাজের প্রতিজনই আমাদের শুভ কামনা।

২০১৯-২০ সন্মানিত সমাজসেবক

শ্রী কার্তিক চন্দ্র প্রামাণিক



দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত মগরাহাট ১নং ব্লকের উস্থি থানার অধীন বরিজপুর গ্রামে জন্ম শ্রী কার্তিক চন্দ্র প্রামাণিকের। ঐ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের শুরু। পরে উত্তরকুসুম হাইস্কুল (বাড়ী থেকে দু কি.মি. দূরে) থেকে স্কুল ফাইনাল পাস। তারপর ডায়মন্ডহারবার ফকির চাঁদ কলেজ থেকে পি.ইউ. বাংলা অনার্স সহ বি.এ এবং বি.এড ডিগ্রী অর্জন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ এবং পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ।

গ্রামে সালিশি বিচার, মীমাংসার নামে মোড়লতান্ত্রিক অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ২৯শে অক্টোবর ১৯৭২ সালে জনকল্যাণ সমিতির জন্মের তিনি ছিলেন অন্যতম কাভারী। সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে মহিলাদের যুক্ত করার জন্য ১৯৭৭ সালে গঠন করেন জনকল্যাণ মহিলা সমিতি। পরে উত্তরসুরী তৈরীর মানসে গঠন করা হয় জনকল্যাণ সমিতির জুনিয়র ইউনিট - ১৯৯৭ সালে।

জনকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে শ্রী কার্তিক চন্দ্র প্রামাণিক ও সহকর্মীরা দীর্ঘদিন যাবৎ জনসেবা মূলক কাজকর্ম করে আসছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৭৭ সালে কলকাতাস্থ শরিক (SAREEK) নামক সংস্থার সঙ্গে সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ করা। ঐ সময় মগরাহাট ১নং ব্লকের ৩০টি স্বচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিয়ে গ্রামীণ উদ্যোগ পরিষদ

গঠন, গণশিক্ষা কেন্দ্র, নাট্যপ্রশিক্ষণ শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পথনাটিকা ইত্যাদির মাধ্যমে এলাকার মানুষকে সচেতন করার কাজ চলতো। নাট্যচর্চার বিষয়ে প্রয়াত নাট্যকার বাদল সরকার মহাশয় প্রভূত সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

এছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় ও শ্রী প্রামাণিকের নেতৃত্বে জনকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে ৭৫০০ ধোঁয়াহীন চুল্লা তৈরী করা হয়েছে, ৪টি ব্লকে ৬৫টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, ৮৭৫টি পরিবারকে স্বল্পমূল্যে শৌচাগার করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে চলছে একটি কে.জি ও নাসরী স্কুলও, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই দুঃস্থ পরিবারের। শ্রী প্রামাণিক ও তাঁর সংগঠন মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়েও কাজ করেন, এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ১৯৮৫। এই প্রকল্পে আই.আই.এম.সি (সোনারগাঁ, সোনারপুর) সার্বিক সহায়তাদান করেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্প, সঙ্গে বিবিধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। ৫০০ এর বেশি মহিলাকে তারা স্বাবলম্বী করেছেন। নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য শিবির, প্রতিবন্ধীদের সাজ সরঞ্জাম বিতরণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বই বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়। তিনি মন্দিরবাজার ব্লকে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠাও করেছেন। ২০০৪ সালে সোনারপুরে একটি Text Book Library প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন ডঃ সুজন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সত্যব্রত চৌধুরী, অধ্যক্ষ গোকুল দাস, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সামাজিক এবং ধর্মীয় কুসংস্কার প্রতিরোধ ও রাস্তা এবং জলপথ সংস্কার করতে গিয়ে তিনি বহু রকমভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন, পুলিশ কেসের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু থেমে যান নি। করতে গিয়ে একাধিকবার পুলিশ কেস হয়েছে।

সমাজসেবার কাজে যুক্ত থাকার কারণে সঞ্জীব সরকার, রেভারেন্ড বিলাস দাস, সরল চ্যাটার্জী, বিপ্লব হামিল, সুকুমার সিং, অধ্যক্ষ সত্যব্রত চৌধুরী, ডাঃ সুজিত কুমার ব্রহ্মচারী, নাট্যকার বাদল সরকার, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসার তাঁর সুযোগ হয়েছে।

শ্রী কার্তিক চন্দ্র প্রামাণিক ও তাঁর সংগঠনকে তাঁদের নিঃস্বার্থ সমাজসেবার জন্য আমরা 'বিপ্লব হামিল স্মারক সম্মান' জানাই ও তাঁদের ভবিষ্যতে সমস্ত সমাজ কল্যাণমূলক উদ্যোগের প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা।